সহুল আহমদ

বাংলাদেশ জেনোসাইড[১] ১৯৭১: নির্ধারিত গোষ্ঠী এবং নিয়ত [ইনটেনশন] এর পুনর্পাঠ

সূচনা

১৯৪৮ সালে *আন্তর্জাতিক জেনোসাইড কনভেনশন* জেনোসাইডের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সে সংজ্ঞার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে জেনোসাইডমূলক কর্ম [জেনোসাইডাল একশন], নির্ধারিত গোষ্ঠী [ন্যাশনাল, এথনিক্যাল, রিলিজিয়াস ও রেসিয়াল], জেনোসাইডের নিয়ত [ইনটেনশন], এবং শাস্তিযোগ্য কর্ম। অর্থাৎ, কোন কোন গোষ্ঠীর ওপর 'নিয়ত' সহকারে জেনোসাইডমূলক কর্ম সম্পাদন হচ্ছে সেটার ওপর নির্ভর করে কোনো ঘটনাকে জেনোসাইড বলা হবে কিনা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত জেনোসাইডকে যারা স্বীকার করেন তাদের মধ্যে নির্ধারিত গোষ্ঠী, অর্থাৎ হিন্দু জেনোসাইড নাকি বাঙালি জেনোসাইড, নিয়ে একধরণের নীরব বিতর্ক চালু আছে। আবার যারা অস্বীকার করেন তারাও কনভেনশনের সংজ্ঞাকে ব্যবহার করেন। এই প্রবন্ধে প্রধানত *কনভেনশন* প্রদত্ত সংজ্ঞায় নির্ধারিত গোষ্ঠীর ধারণাকে সমস্যায়িত [প্রবলেমেটাইজ] করা হয়েছে। বাংলাদেশের জেনোসাইডের ক্ষেত্রে যারা আলোচনা করেন তারা নির্ধারিত গোষ্ঠীকে *রিজিড* বা একাট্টা কোনো একটি গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ মনযোগ দিয়েছে কীভাবে আক্রমণকারী তার নির্ধারিত গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে সেদিকে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের জেনোসাইডের নির্ধারিত গোষ্ঠী ও নিয়ত বিষয়ক আলাপকে বিস্তার করে মূলত *কনভেনশনের* নির্ধারিত গোষ্ঠীর ধারণাকে সমস্যায়িত করা হয়েছে।

ইভেন্টস অফ ইস্ট পাকিস্তান

জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক আইনবিদ পরিষদ [ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্ট] থেকে ১৯৭২ সালে *The Events of East Pakistan, 1971* শীর্ষক

প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।[২] প্রকাশনার নাম ও সংগঠনের পরিচিতি আমাদের জানান দিচ্ছে যে, প্রকাশনাটি একাত্তর সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলীর আইনি অধ্যয়ন। এই ধরনের অধ্যয়ন সম্ভবত এটাই যে প্রথম ছিল তা প্রকাশের তারিখ থেকে আন্দাজ করা যায়। মোট সাতটা অধ্যায়ে বিভক্ত এই প্রতিবেদনে পুরো ঘটনার পটভূমি, মার্চ-ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটনার রূপরেখা, পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাসমূহের আইনি দিক, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, এবং জাতিসংঘ ও ভারতের ভূমিকাকে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, প্রতিটা আলাপে আইনি-দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ঘটনার রূপরেখা প্রণয়নে মার্চ-ডিসেম্বরকে দুটো কালপর্বে ভাগ করা হয়েছিল: ১-২৫ মার্চ এবং ২৬ মার্চ-১৮ ডিসেম্বর। সেখানে বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের সাক্ষ্যকেই প্রধান অনুষঙ্গ হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনের মুখবন্ধে জানানো হচ্ছে যে, ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠনের আহ্বান করা হয়। নভেম্বরে তিনজন প্রখ্যাত আইনবিদকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল মোটাদাগে মার্চের ১ তারিখ থেকে মানবাধিকার লংঘনের 'প্রকৃতি, মাত্রা ও কারণ' অনুসন্ধান করা। ভারতীয় সরকার এবং বাংলাদেশ সরকার পুরোদমে সাহায্য করলেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কোনো ধরনের সাহায্য করতে অপারগ ছিল। উল্লেখ করা দরকার যে, পাকিস্তানের বিশেষ আদালত গঠনের বিরোধীতা করে আন্তর্জাতিক আইনবিদ পরিষদ এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখ একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। সেখানে স্পষ্টত উল্লেখ ছিল:

> The International Commission of Jurists has always disapproved of the establishment of special tribunals to try political opponents for alleged political offence...If Sheikh Mujibur Rahman or other Awami League Leaders have committed any offence under the law of Pakistan there is no reason why they should not be brought before the internationally respected civilian courts of the country.[৩]

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসকে বোঝার জন্য এই প্রতিবেদন খুব গুরুত্বপূর্ণ, এর নানাবিধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাও জরুরি। তবে আমার প্রবন্ধের জন্য আমি কেবল জেনোসাইড প্রসঙ্গটাকেই (পৃষ্ঠা ৫৫-৫৭) বিবেচনায় নেব। ১৯৪৮ সালে *জাতিসংঘের কনভেনশনে* পাশ হওয়া জেনোসাইডের সংজ্ঞা এবং এর

অধীনে কোন কোন কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেগুলো শুরুতে বলা হয়। সতর্কবাণী দেয়া হয় যে, জেনোসাইড শব্দকে যত্রতত্র ব্যবহার করা হলেও, এমনকি এই ক্ষেত্রে দুই তরফ থেকেই একে-অপরের বিরুদ্ধে জেনোসাইডের অভিযোগ তুললেও, আইনজীবীদের কাছে এই শব্দের একটি নিখুঁত গূঢ়ার্থ রয়েছে। এবং সেই অর্থটা জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞা ও সীমানাতেই আবদ্ধ।

সংজ্ঞানুযায়ী বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে জেনোসাইড বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে যাওয়ার পূর্বে সংজ্ঞার কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়। *কনভেনশনের* দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বরাত দিয়ে বলা হয় যে, এই অপরাধের সারসত্তা [এসেন্স] আসলে একটি বিশেষ *নিয়তের* মধ্যে নিহিত, অর্থাৎ নির্দিষ্ট চারটি গোষ্ঠীকে [ন্যাশনাল, এথনিক্যাল, রিলিজিয়াস বা রেসিয়াল] সামগ্রিক বা আংশিক ধ্বংস করার নিয়ত। জেনোসাইড হওয়ার জন্য উপরোক্ত এই চার গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে, এবং সামগ্রিক বা আংশিক ধ্বংস নিয়ত থাকতে হবে। কোনো একটা গোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এটা জেনোসাইড প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়, বরঞ্চ প্রমাণ করতে হবে যে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে কেবল এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত সদস্য ছিলেন বলেই। এবং সেটা উপরোক্ত চারটা গোষ্ঠীর কেউ না কেউ হতে হবে। রাজনৈতিক গোষ্ঠী আক্রান্ত হলে তাকে জেনোসাইড বলা যাবে না, সংজ্ঞা মতো। এই হচ্ছে প্রতিবেদনের আলাপের একেবারে গোড়ার যুক্তি। বাংলাদেশে ঘটনাবলীকে জেনোসাইড বলা যাবে কিনা সেটা নির্ভর করবে এই কাঠামোর নিরিখে।

যদিও বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সকল সামরিক কর্মকাণ্ড ও আগ্রাসনকে জেনোসাইড হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু প্রতিবেদনের যুক্তি হচ্ছে, কোনো একটা জাতিকে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত্বশাসন না দেয়ার পদক্ষেপ জেনোসাইড বলে গণ্য করা যায় না। জেনোসাইডের জন্য নির্মূল বা ধ্বংসের নিয়তটাকে প্রমাণ করতে হবে। প্রতিবেদন স্বীকার করছে যে, প্রচুর বাঙালি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন, তৎসত্ত্বেও তাদের যোগাড়কৃত আলামত ও সাক্ষ্য থেকে এটা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য যে, কেবল 'বাঙালি' ছিলেন বলেই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকার অপারেশন সার্চলাইটে তিনটা গোষ্ঠীকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল: আওয়ামীলীগ, ছাত্র এবং হিন্দু। আওয়ামীলীগ ও ছাত্র এই দুই গোষ্ঠী নির্ধারিত গোষ্ঠীতে অন্তর্ভূক্ত নয়, কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে উপরোক্ত সংজ্ঞার কাঠামোতে পড়ে যায়। প্রতিবেদন বলছে যে, প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত- আলামত সবকিছুই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর

জেনোসাইডের প্রমাণ দিচ্ছে। অর্থাৎ, হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেনোসাইডের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কেবল হিন্দু হওয়ার কারণেই মারা হয়েছে, বাড়ি পোড়ানো হয়েছে এমন ঘটনা বিস্তর ঘটেছে। হিন্দুদেরকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, প্রতিবেদনের মতে, যা কিনা জেনোসাইডের নিয়তের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করে। তবে তাই বলে বাঙালিদের ওপর একেবারেই জেনোসাইড হয়নি এমন কোনো সিদ্ধান্তে প্রতিবেদন পৌছায়নি, বরঞ্চ তাদের কথা হচ্ছে, যদি এটা প্রমাণ করা যায় যে একটা নির্দিষ্ট ঘটনায় বহুজনকে হত্যা করা হয়েছে কেবল তারা বাঙালি ছিলেন বলেই তবে জেনোসাইডের অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিয়ত ও নির্ধারিত গোষ্ঠী

বলা হয়েছে, কোনো ঘটনা জেনোসাইডাল কিনা সেটার জন্য দুটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সাধারণত আমলে নেয়া হয়: নিয়তের [ইনটেনশন] উপস্থিতি এবং নির্ধারিত আক্রান্ত গোষ্ঠী। অর্থাৎ, যারা জেনোসাইডের শিকার তারা সংজ্ঞা প্রদত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন কিনা এবং এই গোষ্ঠীর মধ্যে থাকার কারণেই কেবল তারা হত্যা বা সংজ্ঞা প্রদত্ত কার্যকলাপের শিকার হচ্ছেন কিনা - এই দুটো বিচার্য। নিয়ত প্রমাণ করা জেনোসাইডে সবসময়ই একটা তর্ক-বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেনোসাইড অস্বীকার করা বা নামকরণ নিয়ে যে রাজনীতি তার অধিকাংশ আসলে এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। হাল আমলে রোহিঙ্গা জেনোসাইড অস্বীকার করার বেলাতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এই যুক্তি দিয়েছিল যে, নিয়ত প্রমাণ করা যায়নি।[৪] অন্যদিকে যে চারটি গোষ্ঠী সংজ্ঞায় নির্ধারণ করা হয়েছে এগুলোর মধ্যকার বিরাজমান অস্পষ্টতাও নামকরণ নিয়ে রাজনীতির জন্ম দিয়ে থাকে। যেমন দারফুরের ঘটনার বেলাতে আরব বনাম কালো আফ্রিকান গোষ্ঠীর বিভাজন নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।[৫]

জেনোসাইড সংক্রান্ত এই দুই আলাপ কেবল *কনভেনশন* নির্ধারিত সীমানায় আটকে নেই। গবেষকগণ এই আলাপকে আরো বিস্তৃত করেছেন। স্কট স্ট্রাউস বিভিন্ন জেনোসাইড গবেষক প্রদত্ত ও *কনভেনশনে* নির্ধারিত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে একটা তুলনামূলক চিত্র এঁকেছিলেন।[৬] যেমন বিভিন্নজনের আলাপে আরো কিছু বিষয় হাজির হয় যা কনভেনশনের সংজ্ঞাতে অনির্দিষ্ট রয়েছিল। কনভেনশন নির্ধারিত গোষ্ঠী থেকে বাদপড়া 'রাজনৈতিক' বর্গটাকে পরবর্তীতে অনেকেই আমলে নিয়েছেন। কেউ কেউ জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মগত, নৃ-গত ইত্যাদি বর্গের কথা উল্লেখ না করে বরঞ্চ

'ডিফেন্সলেস, হেল্পলেস হিউম্যান বিয়িং', বা 'হিউম্যান কালেক্টিভিটি' ধরণের বিস্তৃত ধারণা পেশ করেছেন। কিন্তু এই গোষ্ঠী সংক্রান্ত আলাপে অবধারিত ভাবে চলে আসে আক্রমণকারী কর্তা [এজেন্ট অফ এনিহিলেশন]। কনভেনশন সহ কেউ কেউ আক্রমণকারী কর্তাকে নির্দিষ্ট করেনি, তবে যারা নির্দিষ্ট করেছেন তারা কর্তা হিসাবে 'রাষ্ট্র', 'কর্তৃত্বপরায়ন রাষ্ট্র' ধরণের বর্গকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রই প্রধানত জেনোসাইডের জন্য দায়ী থাকে। বিশ বা একুশ শতকের অধিকাংশ জেনোসাইডের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রই আসলে কোনো একটা জনগোষ্ঠীর ওপর জেনোসাইড চালিয়েছে। আক্রমণকারী কর্তা ও নির্ধারিত গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে যে, আক্রমণকারীই 'টার্গেট' গোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করে দেয়। ভিক্টিম নিজে তার গোষ্ঠীকে কীভাবে চিহ্নিত করে, এটার চেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে আক্রমণকারী কর্তা, তা সে রাষ্ট্র বা অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিই হোক, কীভাবে ও কোন নামে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে আদতে 'এসেনশিয়াল' বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, সেই গোষ্ঠী কাল্পনিক নাকি বাস্তব, এগুলো প্রাসঙ্গিক থাকে না, বরঞ্চ আক্রমণকারী যদি মনে করে তার মধ্যে 'এসেনশিয়াল' বৈশিষ্ট্য আছে, তাহলে সেটা সেভাবেই চিহ্নিত হয়। জেনোসাইড সংক্রান্ত আলাপের জন্য এটা তাই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে গোষ্ঠীর মধ্যকার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে কিনা খোঁজার চাইতে আক্রমণকারীর যুক্তিকাঠামোতে কীভাবে সেই কাল্পনিক বা বাস্তবিক 'গোষ্ঠী' ধরা দিচ্ছে, চিহ্নিত হচ্ছে ও নির্ধারিত হচ্ছে সেটা খোঁজা জরুরি।

টার্গেট গোষ্ঠীর সাথে আক্রমণকারী কর্তার এই সম্পর্ক বিবেচনায় নিলে জেনোসাইডের নিয়ত খুঁজে পাওয়া তুলনামূলক সহজ হতে পারে। আধুনিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি জেনোসাইড সংঘটন করে তাহলে সরাসরি নিয়ত প্রমাণ করা কঠিন, এবং সাধারণত এটাই হয়ে থাকে। আক্রমণের প্রকৃতি যেমন নিয়তের প্রমাণ হাজির করতে পারে, পাশাপাশি জেনোসাইডাল পলিসির উপস্থিতি নিয়তের প্রমাণ হাজির করে। গবেষকরা নিয়তকে কখনো নিয়তই বলেছেন, আবার কখনো কখনো 'পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ', 'কো-অর্ডিনেটেড প্ল্যান', 'ডেলিবারেট ডেস্ট্রাকশন' ও 'প্রিমেডিয়েটেড' ইত্যাদি শব্দবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এগুলো থেকে বোঝা যায় কেন্দ্রীয় নির্দেশনা, পদ্ধতিগত পরিকল্পনা ইত্যাদি আসলে নিয়তের প্রমাণস্বরূপ। হত্যাযজ্ঞের প্রকৃতির পাশাপাশি আক্রমণকারী কর্তার পলিসি, নির্দেশনা, পরিকল্পনা এগুলো জেনোসাইডের নিয়তকে প্রমাণ করে।

উপরোক্ত *প্রতিবেদনে* আমরা দেখেছি, আক্রমণের প্রকৃতি হিন্দু

জেনোসাইডের সাক্ষী দিচ্ছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর জেনোসাইড সংঘটিত হয়েছে। এ মতের সাথে আরো অনেক গবেষকই একমত হয়েছেন। সম্প্রতি চৌধুরী শহীদ কাদের ১৯৭১ সালে সংঘটিত ১০০টি ঘটনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ[৭] করে দেখিয়েছেন যে, এই ১০০ টি ঘটনার মধ্যে প্রায় ২৩ টি ঘটনা এমন ছিল যে সেখানে কেবল হিন্দুদেরকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ১০০টি ঘটনা থেকে প্রায় ৫০১৩ জন শহিদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, সেখানে প্রায় ৪৩%-ই হিন্দু ছিলেন। আবার, একাত্তর সালে ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের মধ্যে সিংহভাগই হিন্দু ছিলেন। ফলে এই ঘটনাগুলো থেকে একাত্তরের ঘটনাবলীকে হিন্দু-জেনোসাইড বলার দিকেই শহীদ কাদেরের ঝোঁক। কেউ কেউ একাত্তরের সহিংসতাকে নানা বর্গে ভাগ করেন, জেনোসাইড, পলিটিসাইড ইত্যাদি।[৮] হিন্দু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেটা জেনোসাইড। আবার, যেহেতু পাকিস্তানি বাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে আওয়ামীলীগ তথা সম্ভাব্য মুক্তিবাহিনীর লোক অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন ফলে সে অংশ পলিটিসাইড।

ওয়ারদাতুল আকমাম জাতিসংঘের *কনভেনশনে*র বিপরীতে পাঁচজন গুরুত্বপূর্ণ জেনোসাইড গবেষকের সংজ্ঞার 'রিজিডিটি' ও 'লিবারেলিবিটি' এর তুলনামূলক বিচার করে দেখান যে, প্রতিটি সংজ্ঞার সবচাইতে 'লিবারেল' অংশকে বিবেচনা নিলে বাঙালি ও হিন্দু দুই জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই জেনোসাইড হয়েছে দেখানো সম্ভব। বুদ্ধিজীবী ও অভিজাতদের হত্যা করলে পুরো 'জাতি' নির্জীব হয়ে যায়, এমন একটা পূর্বানুমানও তার যুক্তি কাঠামোতে ছিল। 'বাঙালি' জেনোসাইড বলার ক্ষেত্রে এই ধারণা ক্রিয়াশীল ছিল।[৯]

এসব ক্ষেত্রে ঘটনাকে আসলে পূর্ব প্রদত্ত সংজ্ঞার ধাঁচেই বর্ণনা করা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, কনভেনশনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছিল হলোকাস্টের পরপরই, ফলে এই সংজ্ঞাতে হলোকাস্ট যতটা নিখুঁতভাবে এটে যায়, পরবর্তী অনেকগুলো ঘটনা ততটা আটে না। এখান থেকেই পরবর্তীতে জেনোসাইড ছাড়াও আরো নানান ধরণের বর্গের আবির্ভাব হয়েছে, এবং সংজ্ঞার সাথে কতটুকু মিলে বা না-মিলে সেটা ঘটনা পরবর্তী বিচার-প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। জিওফ্রে রবিনসন এশিয়ার জেনোসাইডমূলক ঘটনাবলীকে একটু ভিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করেন।[১০] কেনো সেই ঘটনাগুলোকে পরবর্তীতে 'জেনোসাইড' হিসাবে নামকরণ করা হয় নাই, বা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নাই, সে প্রশ্নের উত্তর তার ভিন্নভাবে দেখার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তিনি পূর্ব পাকিস্তান, মিয়ানমার, পাপুয়া ও ইস্ট তিমুরের ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ

করে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখান। এগুলো ছিল রাষ্ট্র-প্রণোদিত সহিংসতা। উপনিবেশত্তোর রাষ্ট্রগুলোর ঔপনিবেশিক সীমানার মধ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা, স্বায়ত্ত্বশাসন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নতুন নতুন সঙ্কট জন্ম দিচ্ছিল। 'এথনিসিটি' রাজনৈতিক বর্গ হিসাবে হাজির হচ্ছিল। নিপীড়নের শিকার হয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়াবাদী আকাঙ্ক্ষা ও পরিচয় হাজির হয়েছিল। রাষ্ট্রগুলো ছিল সামরিক ও স্বৈরাচারী। ফলে স্বাধীনতাকামী, বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের নামে রাষ্ট্রগুলো সহিংসতা চালিয়েছে। আবার ঘটনাগুলো ঘটেছিল স্নায়ুযুদ্ধের আমলে, যখন কিনা বিভিন্ন পশ্চিমা রাষ্ট্র এদের সমর্থন ও সহায়তা দান করেছিল। তার মতে, উক্ত বাস্তবতার মধ্যে আসলে এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে পরবর্তী নিরবতার কারণও খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি বেচলারের বরাত দিয়ে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণগুলো উত্থাপন করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, সাধারণত হলোকাস্টের প্রকৃতি থেকে খুব বেশি আলাদা ঘটনাগুলোকে জেনোসাইড হিসাবে হাজির করতে গবেষকরা ইতস্ততবোধ করেন। এবং যে সকল ঘটনায় আক্রমণকারী ও নিরীহ-নিরস্ত্র [বা ডিফেন্সলেস] আক্রান্তের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন পাওয়া যায় না, সেগুলোকে জেনোসাইড হিসাবে খুব একটা আলোচনা বা বিবেচনা করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানসহ যে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী, স্বায়ত্ত্বশাসন বা স্বাধীনতাবাদী আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে সহিংসতা কেবল এক পাক্ষিক হয় না, বরঞ্চ এক ধরনের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে। কমবেশি দুপক্ষই সহিংসতায় লিপ্ত হয়। ফলে এক্ষেত্রে শতভাগ নিরস্ত্র জনগোষ্ঠী পাওয়া যায় না। জেনোসাইডের সংজ্ঞার যে সরল ছবি সেটা এশিয়ার ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে জটিল হয়ে পড়ার কারণে জেনোসাইড গবেষকদের থেকে এটা খুব একটা দৃষ্টি পায় না। তার মতে, 'সহিংসতা যদি পশ্চিমা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, এবং ভালো বনাম মন্দের সরল ন্যারেটিভ অনুপস্থিত থাকে, তাহলে এটা খুব কম মনযোগ আকর্ষণ করে।'[১১]

জিওফ্রের আলাপ এই জেনোসাইডগুলোর ক্ষেত্রে আক্রমণকারী হিসাবে রাষ্ট্রকেই চিহ্নিত করে এবং আক্রান্ত গোষ্ঠী আসলে বিভিন্নধরণের রাজনৈতিক [স্পষ্টভাবে বললে বিচ্ছিন্নতাবাদী] দাবি সম্বলিত জনগোষ্ঠী। এতে উপরোক্ত *কনভেনশন* নির্ধারিত নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়, রাষ্ট্রই বিভিন্নভাবে এদেরকে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করে দেয়। যেমন, এথনিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে পারে। রাষ্ট্র এগুলোকে রাজনৈতিক গ্রুপ বলে চিহ্নিত করে, 'সন্ত্রাসী', 'ষড়যন্ত্রকারী','রাষ্ট্র-বিরোধী' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে নির্মূল বা দমন পীড়ন করতে পারে। ফলে *কনভেনশন* প্রদত্ত

সংজ্ঞায় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অনুপস্থিতি রাষ্ট্রকে 'জেনোসাইডে' অভিযুক্ত থেকে রেহাই দিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে সংঘটিত জেনোসাইডকে হিন্দু জেনোসাইড বলা হলে জেনোসাইডকালীন ও প্রাক-জেনোসাইড ঘটনাপ্রবাহ এবং পুরো ক্ষমতাকাঠামো সম্পর্কে পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে না। হিন্দু জেনোসাইড বললে হিন্দু বনাম পাকিস্তান রাষ্ট্র দ্বন্দ্বই মূল দ্বন্দ্ব হিসাবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু, সেটা খুবই খণ্ডিত ছবি। জেনোসাইডের পূর্ববর্তীত বছরগুলোতে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের কথা বলা হতো সেটা ছিল পাকিস্তান-রাষ্ট্র বনাম বাঙালি বা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানবাসী। সেখানে 'রেস' হিসাবে বাংলাদেশের বাঙালির কথা আইনবিদ পরিষদের 'রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশনে'ও উল্লেখ ছিলঃ '... discrimination against the Bengalis as a group, with their historical, linguistic, cultural, social and physical differences from the people of West Pakistan, would seem to fall within the term racial discrimination.'[১২] এবং পুরো পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় যে কেবল বাঙালি বা পূর্ব পাকিস্তানবাসী বলেই পূর্ব-পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী নানাবিধ বৈষম্যের শিকার হচ্ছিলেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের ঘটনার ক্ষেত্রে 'হিন্দু', 'বাঙালি' বা 'রাজনৈতিক' বর্গগুলোকে যখন ব্যবহার করা হচ্ছে তখন সেগুলোকে অনড় ও 'রিজিড' বর্গ হিসাবেই সাধারণত ধরে নেয়া হয়। আক্রমণকারী কর্তা কীভাবে সে বর্গগুলোকে চিহ্নিত করছে, কাকে কাকে সেই বর্গের মধ্যে ফেলছে সেটাকে চিহ্নিত করাও জরুরি। যেখানে পাকিস্তান আমলে বাঙালি বা পশ্চিম পাকিস্তান বনাম পূর্ব পাকিস্তান দ্বন্দ্ব ছিল সেটা কীভাবে একাত্তর পাকিস্তান বনাম হিন্দু হলো সেটার উত্তরও আক্রমণকারীদের যুক্তিকাঠামোতে পাওয়া যেতে পারে। একাত্তর সালে যখন বলা হচ্ছে 'হিন্দুরা পাকিস্তানের শত্রু' সেই 'হিন্দু' বর্গতে কাদেরকে ফেলা হচ্ছে?

'হিন্দু' ও 'বাঙালি'

বাঙলা ভাষা ও [পূর্ব পাকিস্তানের] বাঙালিরা 'হিন্দুধর্ম' দ্বারা প্রভাবিত এমন এক ধারণা পুরো পাকিস্তান আমল জুড়েই শাসকগোষ্ঠীর কথাবার্তা, বক্তৃতা, বিবৃতিতে ফুটে উঠতো। দেশভাগের হিন্দু-মুসলমান বিভাজন এই জনগোষ্ঠীকে দুইটা রাষ্ট্রের সাথে জড়িয়ে দিয়েছিল, যদিও কখনো কখনো

কর্তাব্যক্তিরা সকলের জন্য সমান অধিকারের কথাও বলতেন, পাকিস্তান সবার জন্য এমন কথা বলতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এই বিভাজন বিভিন্ন তরিকায় কাজ করতো। রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে নাকি বাঙলাও হবে, সেই তর্কে বাঙলা ভাষা যে 'হিন্দুয়ানি' বা হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত সেদিকে আকারে-প্রকারে নানা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আত্মজীবনী ও ডায়রিতে এমন একটা বয়ান স্পষ্ট বা অ-স্পষ্টভাবে থাকতো। বাঙালি ও বাঙলা ভাষা হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, 'সহি/পুরো' মুসলমান নয়।

মুনতাসীর মামুন পাকিস্তানি জেনারেলদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাদের আত্মজীবনীগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। সেখানে দেখা যায়, পাকিস্তানি সামরিক ও অভিজাতদের কাছে 'হিন্দু', 'হিন্দুয়ানি বাঙালি', 'বাঙালি মুসলমান' ইত্যাদি বর্গগুলো 'সন্দেহপ্রবণ' হিসাবে চিহ্নিত হতো এবং এই বর্গগুলোর সাথে 'ভারতমুখীন' হওয়াটাকে জড়িয়ে উপস্থাপন করা হতো। সে সময়ে অধিকাংশ বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদদের 'ভারতের দালাল' আখ্যায়িত করার জনপ্রিয় চল ছিল, অন্তত ক্ষমতাসীনদের মনে।[১৩]

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর 'ঘৃণা ও ভয়' মেশানো দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আইয়ুব খানের ডায়রি এবং তার আত্মজীবনী। পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন। বর্ণবাদের ছাপ স্পষ্ট ছিল তার চিন্তাভাবনায়। বিভিন্ন মানুষের সাথে তার যে কথোপকথন হত তা ডায়রিতে লিখে রাখতেন। এবং সেই কথোপকথনের রেশ টেনে বাঙালিদের সম্পর্কে প্রচুর বর্ণবাদী মন্তব্যও তিনি ডায়রিতে উল্লেখ করতেন । যেমন, বাঙালিরা খুবই 'সংকীর্ণ ও অনুদার', ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা 'খুবই কম', এরা 'বেইমান ও অবিশ্বস্ত', এরা 'সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট' এবং এদের 'নিজেদের কোন ভাষা ও সংস্কৃতি নেই'। বাঙালিদের কথা মনে হলেই তিনি ভাবেন, 'এরা কেন পশ্চিম পাকিস্তানকে দূরে সরিয়ে হিন্দুদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চায়'। হিন্দুদের ভাষা বলতে তিনি এখানে বাংলাকেই বোঝাচ্ছেন এবং তার মতে মুসলমান তমুদ্দনের 'ভিত্তি হলো উর্দু'। দুটো বিষয় নিয়ে তিনি সর্বদাই চিন্তা করতেন, এক, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতের ষড়যন্ত্র' এবং দুই, 'পূর্ব পাকিস্তানিদের নৈরাশ্যজনক চালচলন'। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিরা যদি বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন করে তাহলে এর বিরুদ্ধে তিনি লড়বেন এবং 'যদি প্রয়োজন পড়ে, রক্তের নদী বয়ে যাবে'। তিনি আক্ষেপ করে এও বলেন যে, 'হিন্দু ও বাঙালি, এর চেয়ে খারাপ সংমিশ্রণ

আর কী হতে পারে'।[১৪]

আইয়ুব খানের আত্মজীবনী, *Friends Not Masters*, প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। সেখানে তার বর্ণবাদী মানসিকতা আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে এক তুলনামূলক আলোচনায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদের 'উত্তম' ও পূর্ব পাকিস্তানিদের 'অধম' বলে চিহ্নিত করেন। সেখানেও তিনি উল্লেখ করেন, বাঙালিরা '...have been and still are under considerable Hindu cultural and linguistic influence.'[১৫]

অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা প্রণয়নে যুক্ত রাও ফরমান আলীর আত্মজীবনীতে পূর্ব-বাংলার বাঙালিরা হিন্দু হয়ে গিয়েছে ধরনের প্রচারণার একটি চূড়ান্ত নমুনা পাওয়া যায়। তার বিবরণীর একস্থানে তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কিত মন্তব্যে এই প্রচারণার আলামত পাওয়া যায়। তিনি লিখেন, তাজউদ্দীন আহমদ 'পশ্চিম পাকিস্তানকে এবং সম্ভবত পাকিস্তানকেও ঘৃণা করতেন। তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত হিন্দু ছিলেন বলে একটা প্রচারণা ছিল। আমি গল্পটিকে সত্য মনে করি না। কিন্তু তাঁর মানসিক গঠনে এর যথেষ্ট প্রকাশ ঘটত'।[১৬] এমন প্রচারণার কিছু বাস্তবতাও একাত্তরে দেখা গিয়েছিল। ১৯৭১ এ একজন পাকিস্তানি অফিসার তাজউদ্দীন আহমদের শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সৈয়দ সাহেব, আপনি ছিলেন আরবি প্রফেসর এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও আপনার অগাধ জ্ঞান রয়েছে। অথচ আপনার মেয়ের কি না বিয়ে দিলেন এক হিন্দুর সঙ্গে'।[১৭] পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানরা যে হিন্দু দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন সেটা বোধহয় বহুকাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতেন। ঘটনার প্রায় ২৮ বছর পরও তার বিশ্বাস যে এমনই ছিল তা তার সাক্ষাৎকারে ফুটে উঠে: 'আমরা এখনো পুরোপুরি বুঝি ও বিশ্বাস করি যে, হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানের মন মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে'।[১৮]

মুনতাসীর মামুন তার বইতে যে কয়টা আত্মজীবনীর বিবরণ দিয়েছেন তার সবগুলোতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষাভাবে এমন বয়ান পাওয়া যায়। এই প্রচারণা যে খুব প্রবল ছিল সেটা ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত গফুর আহমদের মন্তব্যেও পরিষ্কার: 'আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে যাই তখন আমাকে বলা হয় যে, ওখানকার গোটা জনসমষ্টির একটা বড় অংশ পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতে চলে গেছে। তবে স্কুলের শিক্ষকরা যায় নি। ওরা এখনো রয়ে গেছে। আমাকে ঐ সময় আরও জানানো হয় যে, ঐসব হিন্দু শিক্ষক দেশের অখণ্ডতার ধারণার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী ছেলেমেয়েদের মন বিষিয়ে তুলেছে।'[১৯] এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান এই প্রচারণার সারকথা বলেছিলেন এভাবে, '...এই যে প্রচারণার কথা বললেন, ওরা পূর্ব পাকিস্তানে যা করেছে

তাঁর যৌক্তিকতা খাড়া করার জন্যই এটা করা হয়েছে। আমাদের এখানকার সমাজে হিন্দুর তেমন অস্তিত্ব নেই। কাজেই এ ধরনের প্রচারণা এখানে পাত্তা পেতে সক্ষম হয়। যে ব্যবস্থা ওখানে নিয়া হচ্ছিল তাকে যৌক্তিকতা দেবার জন্যই এ প্রচারণার অবতারণা।'[২০]

সাংবাদিক এন্থনী মাসকারেনহাস হিন্দুদেরকে চিহ্নিত করে হত্যার কথা তার প্রতিবেদনে বলেছেন। আবার তার বিবরণেও 'হিন্দু' 'বাঙালি' এই বর্গগুলোর ওভারল্যাপিং পাওয়া যায়। তার সামনেই একজন লোককে হত্যা করা হয়েছিল, তিনি তখন এক পাকিস্তানি মেজরকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন; প্রত্যুত্তরে মেজর বলেছিলেন, 'কারণ সে একজন হিন্দু হতে পারে, হতে পারে একজন বিদ্রোহী, নিদেনপক্ষে একজন ছাত্র বা আওয়ামী লীগার।' এখানে স্পষ্ট দুই ধরণের বর্গের উপস্থিতি পাওয়া যায়, 'ধর্মীয়' ও 'রাজনৈতিক'। আবার আরেকজন মেজরের কথা মাসকারেনহাস উল্লেখ করেন যিনি বলছিলেন, 'এটা পবিত্র এবং অপবিত্রের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ। এখানকার লোকজন নামে হয়তো মুসলমান এবং নিজেদেরকে তারা মুসলমান বলেও থাকে। কিন্তু মনেপ্রাণে তারা হিন্দু। আপনার হয়তো বিশ্বাস হবে না যে, এই সেনানিবাসের মৌলভী কিনা শুক্রবার জুম্মার নামাজে এক ফতোয়া দিয়েছে যে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের হত্যা করবে তারা জান্নাতে যাবে। আমরা ঐ বেজন্মাকে ধরে এনে খতম করে দিয়েছি এবং অন্যদেরকেও খতম করে করছি। যারা বেঁচে যাবে তারাই হবে সত্যিকারের মুসলমান। আমরা তাদেরকে উর্দুও শেখাবো'।[২১]

অর্থাৎ, আমি বলার চেষ্টা করছি যে এখানে জেনোসাইডের লক্ষ্য-বর্গ চিহ্নিত করার জন্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট 'হিন্দু' বর্গটার ব্যবহার আরো বিস্তৃত ছিল। মানে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, যারা জেনোসাইডের পলিসি নির্ধারক ছিলেন তাদের কাছে 'হিন্দু' বর্গটা কেবল 'হিন্দু ধর্মাবলম্বী'দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরঞ্চ 'হিন্দু' প্রভাবিত 'বাঙালি' বা 'বাঙালি মুসলমান' এগুলোও কার্যত কম-বেশি সমানভাবেই ব্যবহৃত হতো। 'হিন্দুধর্মাবলম্বী'দের প্রতি যেমন ঘৃণা ছিল একইভাবে 'হিন্দু প্রভাবিত বাঙালি বা মুসলমান'দের প্রতিও ঘৃণা ছিল। কিছুদিন পূর্বে আনাম জাকারিয়া তার বইতেও এক পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ারের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, বাঙালিদের 'সেকেন্ড রেট পাকিস্তানি' হিসাবে ব্যবহার করা হতো।[২২] কোনো সন্দেহ নেই, এই প্রচারণাতে 'হিন্দু ধর্মাবলম্বী'দেরকে তুলনামূলক বেশি ঝুঁকিতে ফেলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে বিমানবিকীকরণ চলছিল সেটা আসলে এই ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই চলছিল, যারাই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান

নিয়েছিল।

এটা উল্লেখ করা জরুরি, পাকিস্তান রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীকে 'দুষ্কৃতিকারী', 'ভারতের দালাল', 'ইন্ডিয়ান এজেন্ট', 'অ্যান্টি-স্টেট এলিমেন্ট', 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতো। আবার দুষ্কৃতিকারীদের পরিচয় সেটাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, ক) তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সদস্য, তথাকথিত মুক্তিবাহিনী ভর্তিতে সাহায্যকারীরা; খ) স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের খাদ্য, যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহকারী; গ) স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানকারী; ঘ) বিদ্রোহীদের 'ইনফরমার' বা বার্তাবাহকরূপে যারা কাজ করে; ঙ) তথাকথিত মুক্তিবাহিনী সম্পর্কিত নাশকতামূলক লিফলেট, প্যাম্পলেট, প্রভৃতির লেখক বা প্রকাশক।[২৩] এই চিহ্নিত 'দুষ্কৃতিকারী'কে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এই তালিকাতে উপরোক্ত কোনো বর্গকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

জেনোসাইড ও ধর্ষণ

যুদ্ধ-বিগ্রহ-সহিংসতা-দাঙ্গার সাথে ধর্ষণের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের এমন কোনো সহিংস ঘটনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে ভয়, সন্ত্রাস ও জাতিগত নৃশংসতা উৎপাদনে, এমনকি শত্রুকে নিয়ন্ত্রণে নারীর শরীরের ওপর সহিংসতা চালানো হয় নি বা নারীর শরীরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। যুদ্ধকালীন ধর্ষণের সাথে কেবল জোরপূর্বক 'যৌনতুষ্টি' জড়িত থাকেনা, কখনো কখনো বিজিতের সমাজ ও মননের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের মনোবাসনাও থাকে। ধর্ষণ একটা কৌশলও বটে। ধর্ষণের মাধ্যমে হত্যা করা হয়, ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। ধর্ষণকে ব্যবহার করে বাস্তুচ্যুত ও দেশছাড়া করা হয়, দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে সমাজ-পরিবারকে তছনছ করতেও ধর্ষণ কার্যকরী কৌশল। অর্থাৎ, ধর্ষণকে যুদ্ধ বা দাঙ্গার একটা কৌশল/পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

জেনোসাইড কনভেনশন অনুযায়ী যেসব কাজ জেনোসাইডের অন্তর্ভূক্ত তাতে ধর্ষণের কথা নেই, যদিও অনেক পরে এসে ধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বসনিয়া ও রুয়ান্ডা জেনোসাইডের পর জেনোসাইডাল রেপ ধারণাও জনপ্রিয় হয়েছে। *কনভেনশনের* সংজ্ঞা অনুযায়ী 'causing serious bodily or mental harm to members of the group' এবং 'deliberately inflicting on the group conditions of life

calculated to bring about its physical destruction in whole or in part' দুটো জেনোসাইডমূলক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। লিসা শারলাখ এই দুই ধারার বরাত দিয়ে ধর্ষণকেও জেনোসাইডমূলক কাজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। ধর্ষণ আক্রান্তের গুরুতর শারীরিক এবং/অথবা মানসিক ক্ষতি করতে পারে, আক্রান্তের পরিবার ও এথনিক সম্প্রদায়ের মনোবল ধ্বংস করে দিতে পারে। ধর্ষণ যে কেবল শারিরীকভাবে ক্ষতি করে তাও নয়, সমাজ ও পরিস্থিতি ভেদে ধর্ষণ কোনো একটা সমাজের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রেখে যেতে পারে। তিনি বলেন, হত্যার চেয়ে ধর্ষণ আরো চতুর কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, কারণ এটা প্রমাণ করা কঠিন। অনেক সময় সামাজিক ও পরিস্থিতিজনিত কারণে খোদ ভিকটিমই ঘটনা চেপে যান। সাধারণত ধর্ষণের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা আছে কিনা, উপর মহল থেকে এমন কোনো নির্দেশনা ছিল কিনা সেটা প্রমাণ করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। সেনাবাহিনী ও সরকার কখনোই ধর্ষণে উদ্বুদ্ধ করার কথা স্বীকার করেন না। ফলে এটাকে যুদ্ধাবস্থার 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা হিসাবে দেখানো সহজ হয়ে উঠে। আবার, সহিংসতা-উত্তর পরিবেশে তাদের ভিকটিমহুড যেমন নীরবতার চাদরে ঢেকে ফেলা যায়, তেমনি তাদের 'ট্রমা'র রাজনীতিকরণও ঘটে থাকে। সকল ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার নারী যে পরিস্থিতিতে পড়েন সেটাকেও 'দ্বিতীয় ধর্ষণ' বলে অভিহিত করা হয়। তার মতে যদি জেনোসাইডের বিশ্লেষণ নারীর ওপর চালিত সহিংসতাকে আমলে না নেয় তাহলে ধর্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীকে যে হিউমিয়েলিয়েশন বা অপমান করা হয় সেটা পুরোপুরি বোঝা যাবে না। সেখানে নারী কমিউনিটির 'ইজ্জত'/'সম্মান' সংক্রান্ত ধারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার ধর্ষণের মাধ্যমে 'গর্ভবতী' করা, অর্থাৎ নারীর গর্ভকে 'দখল' করার বাসনাও পূরণ করা হয়। লিসা তার বিশ্লেষণে তিনটা কেসস্টাডি উল্লেখ করেন: পূর্ব পাকিস্তান, যুগোশ্লোভিয়া এবং রুয়ান্ডা। তিনটা ক্ষেত্রেই ধর্ষণ ছিল জেনোসাইডের একটি অন্যতম উপাদান।[২৪]

একাত্তর সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী যে ধর্ষণ চালিয়েছিল (প্রায় চার লক্ষাধিক নারী) তা যে খুব পদ্ধতিগত ও পরিকল্পিত ছিল তা নিয়ে ইতোমধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে। ধর্ষণের তীব্রতা, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশ, ধর্ষণের প্যাটার্ন ইত্যাদি অবলোকন করে অনেক গবেষকই এটাকে 'পরিকল্পিত' বলে রায় দিয়েছেন।[২৫] ধর্ষণের শিকার নারীরা যে ধরণের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তার একটা পরিসংখ্যানও ডঃ এম এ হাসান দিয়েছেন। ধর্ষণের শিকার নারীরা শ্বেতস্রাব, তলপেটে ব্যাথা, রক্তস্রাব, মেনোরেজিয়া, ডিসমেনোরিয়াসহ বিভিন্ন ধরণের শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে বিষাদগ্রস্থতা, নৈরাশ্যসহ প্রায় ৮০-৯০ ভাগ নারী দীর্ঘকাল ব্যাপী মানসিক সমস্যাতে আক্রান্ত ছিলেন।[২৬] একাত্তরে ধর্ষণের শিকার নারীদের পরবর্তী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা নিয়েও প্রভাবশালী কিছু গবেষণাও হয়েছে।[২৭] অর্থাৎ, এই নারীরা কেবল যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন তা-ই নয় বরঞ্চ সামাজিকভাবেও প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। উপরন্তু রাজনৈতিক ময়দানে তাদের 'ভিকটিমহুড' এর ব্যবহার তাদেরকে আরো প্রান্তিকে ঠেলে দিয়েছিল।

ড. জিওফ্রে ডেভিস যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ধর্ষণের শিকার গর্ভবতী নারীদের নিয়ে কাজ করেছিলেন। বীনা ডি কস্তার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কীভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা তাদের ধর্ষণকে জায়েজিকরণ করে:

> They had orders of a kind or instruction from Tikka Khan to the effect that a good Muslim will fight anybody except his father. So what they had to do was to impregnate as many Bengali women as they could. That was the theory behind it.[২৮]

বাংলাদেশে যারা একাত্তরে নারী ধর্ষণ নিয়ে কাজ করেছেন তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এমন মনোভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন। একটা 'জাতির চেহারা বদলে দেয়া'র বাসনা তাতে স্পষ্ট।

এখানে ধারা অনুযায়ী ধর্ষণের ঘটনাবলীকে যদি জেনোসাইডমূলক কাজ বা জেনোসাইডের উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আবারো বিবেচ্য 'গোষ্ঠী' বা বর্গ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। কেননা পাকিস্তানি বাহিনীর ধর্ষণের শিকার নারীদেরকে 'বাঙালি' 'হিন্দু' বা 'হিন্দুবাঙালি' ইত্যাদি বর্গে আটা যায় না। বরঞ্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা একালের বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের 'বাঙালি' তা যে কোনো ধর্মেরই হোক, এমনকি আদিবাসী নারীরাও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রেও কোনো সন্দেহ নেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সর্বাধিক ঝুঁকিতে ছিলেন, কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন চিঠিপত্র, মন্তব্যতে 'বাঙালি' বর্গের উপস্থিতিও লক্ষণীয়।

দি রেমেডি

'দি রেমেডি' শিরোনামযুক্ত দলিলটি খুলনাস্থ গণহত্যা জাদুঘরের আর্কাইভে রয়েছে, জাদুঘরে প্রদর্শিতও হচ্ছে।[২৯] এই দলিল সম্পর্কে মুনতাসীর মামুনের লেখা[৩০] এবং অধ্যাপক মাহবুবর রহমানের সাথে সরাসরি কথা বলে জানা

যায় যে, এটি নিয়াজী কর্তৃক লিখিত চিঠি। চিঠিটি কত পৃষ্ঠার ছিল নিশ্চিত নয়, তবে আর্কাইভে রয়েছে তিন পৃষ্ঠা। চিঠিটি পাওয়া গিয়েছিল ব্যবসায়ী এহিয়া আহমদ বাওয়ানীর একটা ফাইলে। সেখানে থেকে সংগ্রহ করেছিলেন লতিফ বাওয়ানী জুট মিলসের তৎকালীন লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মুস্তাফিজুর রহমান। পরে এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএসের সচিব এস এম গোলাম নবীর সংগ্রহে আসে। জাদুঘরে সংগৃহীত এই দলিলের নিচে নীল রঙের কালি দিয়ে হাতে লেখা আছে যে, 'ইহা রাও ফরমান আলীর নিকট লিখিত'।

দলিলটির শুরু হয়েছে একাত্তরের মার্চে সংঘটিত অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে; দাবি করা হচ্ছে যে, মার্চ/এপ্রিল মাসে বিহারিদের ওপর 'সু-পরিকল্পিত' হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। যাদেরকে মারা হয়েছে তারা 'অ-বাঙালি মুসলমান', এবং তাদেরকে 'পশ্চিমা' বলে সম্বোধন করা হতো। যারা মেরেছে তাদের অধিকাংশই 'বাঙালি'। তারা বহিরাগত এই কারণে মারা হয়নি, বরঞ্চ তারা পাকিস্তানি, কেন্দ্রীয় সরকারের কট্টর সমর্থক এবং সামরিক বাহিনীর শুভাকাঙ্ক্ষী - এ কারণে মারা হয়েছে। এই প্রদেশে প্রচুর 'অবাঙালি হিন্দু' ব্যবসায়ী রয়েছেন, যারা 'জয়বংলা শ্লোগানওয়ালা'দের ভাই হিসাবে বিবেচিত হন।

দলিল মতে, বাঙলা দেশ আন্দোলন কেবল আওয়ামী লীগ দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে না, বরঞ্চ এটা আসলে পুরো বাঙালি সম্প্রদায়েরই অভ্যুত্থান। মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, পুলিশ, ইআরপি, আদালতের বিচারক প্রায় সবাই জড়িত ছিলেন এই 'বিদ্রোহে' [রিভোল্ট]। তার প্রমাণ হিসাবে মার্চের ১তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন 'সেকশন' থেকে একের পর এক 'রেজুলেশন' গ্রহণ করা হয়েছে।

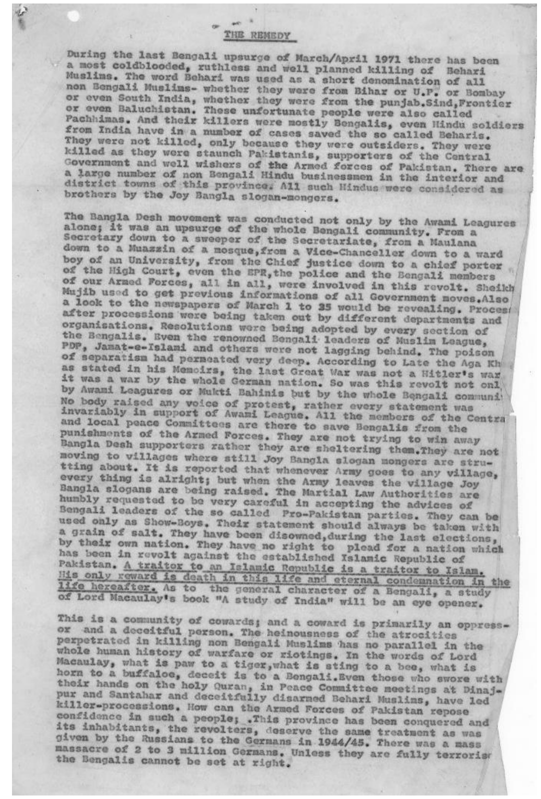

THE REMEDY

During the last Bengali upsurge of March/April 1971 there has been a most coldblooded, ruthless and well planned killing of Behari Muslims. The word Behari was used as a short denomination of all non Bengali Muslims- whether they were from Bihar or U.P. or Bombay or even South India, whether they were from the punjab.Sind,Frontier or even Baluchistan. These unfortunate people were also called Pachhimas. And their killers were mostly Bengalis, even Hindu soldiers from India have in a number of cases saved the so called Beharis. They were not killed, only because they were outsiders. They were killed as they were staunch Pakistanis, supporters of the Central Government and well wishers of the Armed forces of Pakistan. There are a large number of non Bengali Hindu businessmen in the interior and district towns of this province. All such Hindus were considered as brothers by the Joy Bangla slogan-mongers.

The Bangla Desh movement was conducted not only by the Awami Leagures alone; it was an upsurge of the whole Bengali community. From a Secretary down to a sweeper of the Secretariate, from a Maulana down to a Muazzin of a mosque,from a Vice-Chanceller down to a ward boy of an University, from the Chief justice down to a chief porter of the High Court, even the EPR,the police and the Bengali members of our Armed Forces, all in all, were involved in this revolt. Sheikh Mujib used to get previous informations of all Government moves.Also a look to the newspapers of March 1 to 25 would be revealing. Proces[illegible] after processions were being taken out by different departments and organisations. Resolutions were being adopted by every section of the Bengalis. Even the renowned Bengali leaders of Muslim League, PDP, Jamat-e-Islami and others were not lagging behind. The poison of separatism had permeated very deep. According to Late the Aga Kh[illegible] as stated in his Memoirs, the last Great War was not a Hitler's war it was a war by the whole German nation. So was this revolt not onl[illegible] by Awami Leagures or Mukti Bahinis but by the whole Bengali communi[illegible] No body raised any voice of protest, rather every statement was invariably in support of Awami League. All the members of the Centra[illegible] and local peace Committees are there to save Bengalis from the punishments of the Armed Forces. They are not trying to win away Bangla Desh supporters rather they are sheltering them.They are not moving to villages where still Joy Bangla slogan mongers are stru-tting about. It is reported that whenever Army goes to any village, every thing is alright; but when the Army leaves the village Joy Bangla slogans are being raised. The Martial Law Authorities are humbly requested to be very careful in accepting the advices of Bengali leaders of the so called Pro-Pakistan parties. They can be used only as Show-Boys. Their statement should always be taken with a grain of salt. They have been disowned,during the last elections, by their own nation. They have no right to plead for a nation which has been in revolt against the established Islamic Republic of Pakistan. A traitor to an Islamic Republic is a traitor to Islam. His only reward is death in this life and eternal condemnation in the life hereafter. As to the general character of a Bengali, a study of Lord Macaulay's book "A study of India" will be an eye opener.

This is a community of cowards; and a coward is primarily an oppress-or and a deceitful person. The heinousness of the atrocities perpetrated in killing non Bengali Muslims has no parallel in the whole human history of warfare or riotings. In the words of Lord Macaulay, what is paw to a tiger,what is sting to a bee, what is horn to a buffaloe, deceit is to a Bengali.Even those who swore with their hands on the holy Quran, in Peace Committee meetings at Dinaj-pur and Santahar and deceitfully disarmed Behari Muslims, have led killer-processions. How can the Armed Forces of Pakistan repose confidence in such a people; .This province has been conquered and its inhabitants, the revolters, deserve the same treatment as was given by the Russians to the Germans in 1944/45. There was a mass massacre of 2 to 3 million Germans. Unless they are fully terroris[illegible] the Bengalis cannot be set at right.

ছবি: *দি রেমেডি*; কৃতজ্ঞতা- ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর

এমনকি সেখানে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, পিডিপির বাঙালি নেতারাও যুক্ত ছিলেন। 'বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষ' গভীরে প্রবেশ করেছে। আগা খানের স্মৃতিচারণের বরাত দিয়ে বলা হয়, বিগত বিশ্বযুদ্ধ কেবল 'হিটলারের যুদ্ধ' ছিল না, বরঞ্চ সেটা পুরো জার্মানির যুদ্ধ ছিল। একইভাবে এই আন্দোলন আওয়ামী লীগ বা মুক্তিবাহিনীর বিদ্রোহ নয়, বরঞ্চ পুরো বাঙালির বিদ্রোহ। শান্তিকমিটিগুলো আসলে উপরে উপরে সামরিক বাহিনীকে সাহায্যের ভান করলেও আদতে তারা মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছে, আশ্রয় দিচ্ছে। ফলে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষকে এইসব পাকিস্তানপন্থী দলগুলোর 'বাঙালি নেতাদের' পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। তারা 'ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান' এর সাথে বেইমানি করেছে। যারা ইসলামিক রিপাবলিকের সাথে বেইমানি করেছে তারা ইসলামের সাথেও বেইমানি

করেছে। তাদের একমাত্র সাজা হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড।

এরপরেই 'বাঙালি'দের চরিত্র উন্মোচনের দিকে নজর দেয়া হয়। লর্ড ম্যাকলের বরাত দিয়ে বলা হয়, এই 'কমিউনিটি' কাপুরুষ, প্রতারক। অবাঙালি মুসলমান হত্যায় বাঙালি যে নৃশংসতা দেখিয়েছে তার নজির ইতিহাসে নেই। '...what is paw to a tiger, what is sting to a bee, what horn to a buffalo, deceit is to a Bengali'. এমনকি কোরান শরিফে হাত রেখে যে শান্তিকমিটির বাঙালিরা শপথ গ্রহণ করেছে তারাও বিহারীদের সাথে প্রতারণা করেছে। ১৯৪৪/৪৫ সালে জার্মান দখলের পর রাশিয়ানরা জার্মানদের সাথে যে আচরণ করেছে, [প্রায় ২-৩ মিলিয়ন জার্মানকে হত্যার কথা দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে] বাঙালিদের সাথেও একই আচরণ করা উচিতঃ 'unless they are fully terrorize the Bengalis can not be set at right.'

বাঙালিদের 'বেস্টফ্রেন্ড' এখনো ভারত। যে কোনো 'বাঙালি'কে খোঁজা হোক, সে আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদী। কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তাদেরকে আসলে ব্রেইনওয়াশ করা দরকার, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাদেরকে মানসিকভাবে [সেন্টিমেন্টালি] আলাদা করতে হবে। কীভাবে? উত্তর হচ্ছেঃ ভাষা। 'They need a total brainwashing at least ten years. They can be separated sentimentally West Bengal only by change of their language.' ফলে যদি কর্তৃপক্ষ ভেবে থাকেন, যে 'শাস্তি' দেয়া হয়েছে পর্যাপ্ত তাহলে ভুল হবে। পৃথিবীকে স্বাভাবিক দেখানোর জন্য যদি সব খুলে দেয়া হয়, তাহলে পাকিস্তানের ভবিষ্যত খুব 'doubtful' হয়ে উঠবে। বরঞ্চ এই অভিযান আরো চালাতে হবেঃ 'There must be more killing, more mopping up and more witch hunting.'

এই অভিযানের সাফাই গাওয়ার জন্য রুশ উদাহরণ দেয়া হয়েছে। রুশরা যদি কমিউনিজমের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য কয়েক মিলিয়ন ভূমিমালিকদের খতম করতে পারে, তাহলে পাকিস্তানের শত্রুদের খতম করতে অসুবিধা কোথায়? ফলে ভারত ও ইহুদি প্রোপাগান্ডাকে পাত্তা না দেয়ার জন্য বলা হয়। যাদের পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সংহতির ওপর বিশ্বাস আছে কেবল তাদেরই অধিকার রয়েছে পাকিস্তানকে শাসন করার। যদি লাল (মানে, কমিউনিস্ট) দেশগুলোকে কেবল কমিউনিস্টদেরই শাসন করার অধিকার থাকে, তাহলে পাকিস্তানের প্রতি অবিশ্বাসী লোকদের কেন নির্বাচনে দাড়াতে দেয়া হলো? বরঞ্চ এই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করা ও তাদের থেকে রেহাই পাওয়ার দারুণ মওকা এসেছে। কেবল 'হিন্দু'দের নিধন করলেই হবে

না, তাদের সশস্ত্র ভাইব্রাদার, ইসলামের শত্রু, মুরতাদদেরও খতম করতে হবে।

শেষের দিকে আবারো বিহারীদের বিষয়ে বলা হয়। তারাই এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো ভিকটিম। তারা নিরাপত্তাহীনতায় আছে। সামরিক সরকারকে তাদের দেখভালের দিকে নজর দেয়া দরকার। এরপর নয়টি সম্ভাব্য পদক্ষেপের পরামর্শ দেয়া হয়। এই পদক্ষেপগুলোতে দুটো বিপরীতমুখী গোষ্ঠী পাওয়া যায়ঃ বাঙালি ও বিহারী। একদিকে বলা হয় 'বাঙালি' সিভিল অফিসারদের বাদ দিতে হবে (প্রায় ৭৫%); সেনাবাহিনী, গোয়েন্দাসংস্থাকে 'বাঙালি'দের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, কারণ তারা তলে তলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে কাজ করে। অন্যদিকে বিহারীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

আমার আলোচনার বিষয়বস্তু এই দলিলের ঠিকুজি খোঁজা নয়, বরঞ্চ শাসকের অবস্থান থেকে কিছু নির্দিষ্ট মনোভাবের সন্ধান করা। এই চিঠি নিয়াজী বা কার লেখা তার চেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে, অন্তত আমাদের এই আলোচনার জন্য, এই চিঠি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও জেনোসাইডের পলিসি-নির্ধারক কারো লেখা। এখানে 'বাঙালি' বর্গ বিশেষভাবে চিহ্নিত হচ্ছে। এবং, সেই 'বর্গ' তৈরি হচ্ছে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের যুক্তি-কাঠামোর ভেতর থেকে। এক জাতির জন্য এক রাষ্ট্র - এই নীতির সাথে দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণকারীর রাষ্ট্রে থাকার অধিকার নেই। এর সাফাইয়ের যুক্তি আবার বিশ শতকের দুটো বৃহৎ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ঘটনা থেকে উদাহরণ নেয়া হচ্ছেঃ রুশ বিপ্লব বা কমিউনিস্তদের বিপ্লব এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার কাছে জার্মানির পরাজয়। জিওফ্রে যে ফ্রেমওয়ার্কে আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে, এশিয়ার জেনোসাইডগুলোতে রাষ্ট্র 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' লেবেল দাগিয়ে যেভাবে সহিংসতা চালিয়ে থাকে সেটারই প্রমাণ এই চিঠির যুক্তি ও ভাষাতে দেখা যায়।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে মূলত বাংলাদেশের জেনোসাইডের একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে মনযোগ দেয়া হয়েছে। সাধারণত ১৯৭১ সালে সংঘটিত সহিংসতাকে নানা জনে নানা নামে চিহ্নিত করলেও এখানকার হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর জেনোসাইড হয়েছে সেটা প্রায় সবাই মেনে নেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটাকে বাঙালি জেনোসাইড হিসাবে চিহ্নিত করলেও অনেক গবেষকই এটাকে হিন্দু জেনোসাইড বলেন। এটা বলার মধ্যে যে প্রধান যুক্তি সেটা

বাহাত্তরের প্রতিবেদনেই স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে যে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সর্বাধিক ঝুঁকিতে ছিলেন সেটা যে কোনো হিসাব/ পরিসংখ্যানে স্পষ্ট। তদপুরি, হিন্দু-জেনোসাইড বলার ক্ষেত্রে সংজ্ঞা প্রদত্ত 'গোষ্ঠী'কে সমস্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রথমত, কে কোন গোষ্ঠীতে অন্তর্ভূক্ত, সেটা আসলে আক্রমণকারী নির্ধারণ করে দেয়। অর্থাৎ, আপনি আসলেই এই গোষ্ঠীর সদস্য কিনা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আক্রমণকারী আপনাকে কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করে। দ্বিতীয়ত, উপনিবেশত্তোর রাষ্ট্রগুলো ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা নির্ধারিত সীমানার মধ্যে এমন বহু জাতিসত্তাকে খুঁজে পায় যারা কিনা 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে। আধিপত্যশীল জাতিগোষ্ঠীর কাছে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়ে স্বাধীকার, স্বায়ত্ত্বশাসন, স্বাধীনতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন জোরদার হলে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার মাধ্যমে দমন করা এই উপনিবেশত্তোর রাষ্ট্রগুলোর একটি বিশেষ সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এখানে 'বর্গ' অধিকাংশ সময় আক্রমণকারী রাষ্ট্রই ঠিক করে দেয়; জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক এই বর্গগুলো অনেকক্ষেত্রে ওভারল্যাপিং করে। অর্থাৎ, বর্গগুলোর মধ্যে একাট্টা বা খাড়াখাড়ি বিভাজন পাওয়া যায়না। তৃতীয়ত, ফলে এখানে যখন 'বাঙালি' ও 'হিন্দু' বর্গ বলা হচ্ছে তখন আসলে শাসকরা বা পাকিস্তানি রাষ্ট্র কীভাবে সে বর্গগুলোকে চিহ্নিত করছে সেটা দেখা জরুরি। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তানি সামরিক শাসক বা অভিজাতদের কাছে 'বাঙালি' ও 'হিন্দু' দুটো বর্গের মধ্যে কোনো একাট্টা বিভাজন নেই, বরঞ্চ গতায়াত রয়েছে; কখনো কখনো সমার্থক হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়। যার ফলে বাঙালি মুসলমান মাত্রই হিন্দুয়ানি বা হিন্দু দ্বারা প্রভাবিত এমন সব ধারণার ছড়াছড়ি দেখা যায়। চতুর্থত, ধর্ষণকে যদি জেনোসাইডের একটি উপাদান হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় তাহলে বাংলাদেশের ঘটনায় হিন্দু ও বাঙালি বর্গের সীমানা আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠে। পাকিস্তান বাহিনীর কাছে বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমান, অন্যান্য অ-অবাঙালি জনগোষ্ঠী যেমন চাকমা, মারমারাও ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। পঞ্চমত, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী [অথবা শাসকগোষ্ঠী] লিখিত একটি চিঠি আবার স্পষ্ট 'বাঙালি'কে জেনোসাইডের বিশেষ লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করছে। সেখানে অজুহাত হিসাবে ইসলাম ধর্ম যেমন রয়েছে, তেমনি আসলে রাষ্ট্রের সংহতি রয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রবন্ধে জেনোসাইডকে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা রয়েছে এমন একটা সু-পরিকল্পিত ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে; এতে আক্রমণকারী স্পষ্টাভাবে নির্ধারিত; এবং আক্রমণকারীই আক্রান্তগোষ্ঠীকে চিহ্নায়ন করছে। জেনোসাইডের নিয়তের

প্রমাণের জন্য আক্রমণের ধরন/প্রকৃতি যেমন একটা উপায়, তেমনি কেন্দ্রীয় নির্দেশনার উপস্থিতিও আরেকটি উপায়। কেন্দ্রীয় নির্দেশনার সাথে জড়িয়ে থাকে আক্রান্তগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি বা শর্ত। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আরেকটি বড়ো প্রমাণ অপারেশন সার্চলাইট প্রণয়ন।

সর্বশেষ এটা উল্লেখ করা দরকার, বাহাত্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিহারিদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বিহারী হত্যাকাণ্ড জেনোসাইড হবে কিনা সেটা নিয়ে প্রতিবেদনে আইনি মতামত দেয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিহারী হত্যাকাণ্ডকে আলাপের বাইরে রাখা হয়েছে, কেননা এটা নিয়ে স্বতন্ত্র দীর্ঘ আলাপের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রেও একইভাবে আক্রমণকারী, আক্রান্তগোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় নির্দেশনার খোঁজ নিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. পুরো প্রবন্ধ জুড়ে 'গণহত্যা' ব্যবহার না করে 'জেনোসাইড' ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ উদ্দেশ্যেই। বাংলা একাডেমি অভিধানে genocide এর পরিভাষা হিসেবে 'গণহত্যা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'গণহত্যা' না বলে 'জেনোসাইড' বলার দুটো প্রধান কারণ আছে। প্রথমত 'জেনোসাইড' শব্দ দিয়ে যে একটা প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে, অর্থাৎ নির্ধারিত একটা গোষ্ঠীকে আংশিক বা পুরোপুরি ধ্বংস করার নিয়তে পরিকল্পিতভাবে কিছু নির্দিষ্ট অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, আন্তর্জাতিক আইনের যেটাকে 'অপরাধ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই গোটা প্রক্রিয়াটা 'গণহত্যা' শব্দের মধ্যে আটে না। 'গণহত্যা'র অর্থ সেদিক থেকে ইংরেজি শব্দ 'ম্যাসাকারে'র নিকটবর্তী। কেননা, 'জেনোসাইড' প্রক্রিয়াতে কেবল 'হত্যা'ই জড়িত না, হত্যা বা নিধনের বাইরেও আরো বহু বিষয় রয়েছে। *জেনোসাইড* ও *গণহত্যা* দুই শব্দের ব্যবহারগত ফারাক নিয়ে আরো অনেকেই লিখেছেন। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ময়দানে এই শব্দের বহুল ব্যবহার শব্দকে তার মূল অর্থ থেকে একধরণের বিচ্ছেদও ঘটিয়েছে। যেমন, ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইত্তেফাকের হেডলাইন ছিল 'বাংলার বুকে এ গণহত্যা বন্ধ কর!' একাত্তরের পূর্বেও বিভিন্ন বিবৃতিতে এটার ব্যবহার পাওয়া যায়। আবার সাম্প্রতিক সময়ে যে কোনো রাষ্ট্রীয় ভায়োলেন্স যা প্রাণহানি ঘটিয়ে থাকে তাকে 'গণহত্যা' বলার প্রবণতাও এখানে রয়েছে। এই অবস্থান থেকে স্পষ্টত দূরত্ব তৈরি করার জন্য 'জেনোসাইড' শব্দটা ব্যবহারই যৌক্তিক ও যথার্থ বলে মনে করি।

২. *The Events in East Pakistan, 1971*, A legal study by the Secretariat of the International Commission of Jurists. Geneva: 1972.

৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় (মুদ্রণ ২০১১), পৃ. ৭২১

৪. সহুল আহমদ, 'রোহিঙ্গা জেনোসাইডঃ আর্তনাদ শোনার কেউ নেই', *শুদ্ধস্বর*, ২৬ আগস্ট ২০২০

৫. Mahmood Mamdani, 'The Politics of Naming: Genocide, Civil War, Insurgency', *London Review of Books,* Vol. 29 No. 5 · 8 March 2007
৬. Scott Straus, 'Contested meanings and conflicting imperatives: A conceptual analysis of genocide', *Journal of Genocide Research,* 3:3, 349-375, 2001, DOI: 10.1080/14623520120097189
৭. চৌধুরী শহীদ কাদেরের 'বাংলাদেশ গণহত্যায় ধর্ম, লিঙ্গ ও বয়সের প্রভাব: একটি কেস স্টাডি' প্রবন্ধটি এই জার্নালেই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যখন কাজ করছিলেন তখন এই বিষয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তিনি তার প্রকাশিতব্য গবেষণা ও এর ফলাফল আমাকে দেখতে দেয়ার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অন্যান্যদের কাজের চেয়ে তার এই কাজের আলাদা বিশেষত্ব হচ্ছে বাকি সবাই যেখানে বাহাত্তরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক আইনবিদ পরিষদ এর প্রতিবেদনের যুক্তিই ব্যবহার করেছেন, চৌধুরী শহীদ কাদের মাঠ পর্যায়ের কেস-স্টাডিকে আমলে নিয়েছেন।
৮. Sarmila Bose, 'Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971.' *Economic and Political Weekly,* vol. 40, no. 41, pp. 4463–4471, 2005. *JSTOR,* www.jstor.org/stable/4417267. Accessed 23 Aug. 2021.
৯. Wardatul Akmam, 'Atrocities against humanity during the liberation war in Bangladesh: A case of genocide', *Journal of Genocide Research,* 4:4, 543-559, 2002. DOI: 10.1080/14623502200000463
১০. Geoffrey Robinson, 'State-Sponsored Violence and Secessionist Rebellions in Asia.' In Donald Bloxham and A. Dirk Moses eds. *The Oxford Handbook of Genocide Studies*. New York and Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 466-88.
১১. *Ibid.*
১২. *The Events in East Pakistan, 1971,* P. 52
১৩. মুনতাসীর মামুন, *পাকিস্তানি জেনারেলদের মন: বাঙালি, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ*, সময় প্রকাশন, ২০১০; মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দীন আহমেদ, *পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, ইউপিএল, ২০০৫।
১৪. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামীলীগের উত্থানপর্ব: ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা, ২০১৬, পৃ. ১৫৮-১৬৪
১৫. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters: A Political Autobiography,* The University Press Limited (UPL), 2008, P.187
১৬. রাও ফরমান আলী খান, *বাংলাদেশের জন্ম,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল), ২০১৭
১৭. শারমিন আহমদ, *তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা*, ঐতিহ্য, ২০১৫
১৮. মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ২০০৫, পৃ. ৩১৫

১৯. মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ২০০৫, পৃ. ২০৬
২০. মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ২০০৫, পৃ. ১১৬
২১. ফজলুল কাদের, *বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*, সংঘ প্রকাশন, ২০০৩
২২. Anam Zakaria, *1971: A People's History from Bangladesh, Pakistan and India,* Penguin, 2019, P. 19
২৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : সপ্তম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় (মুদ্রণ ২০১১), পৃ. ৫৮৩
২৪. Lisa Sharlach, 'Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda.' *New Political Science*. 22. 89-102, 2000.
২৫. হামিদা হোসেন, আমেনা মহসিন, সেলিনা হোসেন, *একটি জাতির জন্ম: যৌন সহিংসতা ও দায়মুক্তি*, ইউপিএল, ২০১৮; Susan Brownmiller, *Against Our Will: Men, Women, and Rape,* Simon & Schuster, 1975; মুনতাসীর মামুন, *বীরাঙ্গনা ১৯৭১*, সুবর্ণ, ২০১৩; এম এ হাসান, যুদ্ধ ও নারী, তাম্রলিপি, ২০০৮; *নারীর-৭১ ও যুদ্ধ পরবর্তী কথ্য কাহিনী*, আইন ও সালিশ কেন্দ্র প্রকাশনা
২৬. এম এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*, তাম্রলিপি, ২০০৮, পৃ. ৫০-৫৩
২৭. Nayanika Mookherjee, *The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories, and the Bangladesh War of 1971,* Duke University Press, 2015; Angela Debnath, "The Bangladesh Genocide: The Plight of Women", In Totten, S. (Ed.). (2009). *Plight and Fate of Women During and Following Genocide: Genocide: A Critical Bibliographic Review* (2nd ed.). Routledge; সায়েমা খাতুন, *মুক্তিযুদ্ধের His-Story ইজ্জত ও লজ্জা*, পাবলিক নৃবিজ্ঞান, ২০১৫; নিলীমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, জাগৃতি, ২০১৩ (ষষ্ট সংস্করণ)
২৮. Bina D'Costa, "1971: Rape and its consequences", *Bdnews24.com,* 15th Dec 2010
২৯. 'দি রেমেডি' শিরোনামের তিন পৃষ্ঠার এই দলিলটি খুলনাস্থ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই দলিলটি আমাকে ব্যবহার করতে দেয়ার জন্য জাদুঘরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।
৩০. মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: অন্যভাবে দেখা*, সময় প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ১১৬-১২১